একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Website: http://ekusherdheu.in

Shakta-Vaishnava Conflict and Harmony: In the Social Mirror of Shakta Padabali

শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়: শাক্ত পদাবলীর সামাজিক দর্পণে

Name of the Author: Anindita Adhikari

Affiliation: Research Scholar, Rabindra-Bharati University
West Bengal, India

Abstract: The majority of the population in India follows Hinduism. The Hindu community is divided into numerous sects and sub-sects. While these sub-sects influenced one another, there are also historical instances of communal conflict and animosity. The rivalry between the Vaishnavas (followers of Vishnu/Krishna) and Shaktas (followers of Shakti/the Goddess) is historically famous, with many examples found in medieval Bengali literature. The surge of Vaishnavism sparked by Chaitanya Mahaprabhu's influence largely subsided after his passing. During this period, the caste system began to reassert itself within Vaishnavism. Consequently, people from lower social strata began leaning toward Tantra-based practices. As the influence of Vaishnavism waned, Shakta worship began to emerge prominently in society from the 17th century onwards. Amidst the social and political turmoil of the 18th century, the Goddess Kalika manifested in the public consciousness as an infinite, compassionate, and affectionate Mother—a supreme divine refuge. Responding to the needs of the era, 18th-century Shakta poets like Ramprasad Sen, Kamalakanta Bhattacharya, and Dasharathi Ray expressed the oneness of and Shyama
This harmonizing tendency is observed in the Panchali (devotional songs), Kobigan, and even in Girish Chandra Ghosh's play, Jana. The seeds of monotheism, humanism, and the socio-religious reform movements of the 19th-century Bengali Renaissance were arguably sown in the 18th century. The Shakta Padavali serves as a true reflection of this transitional spirit.

Key Word: Hinduism, Sectarian Harmony, Conflicts, Vaishnavism, Chaitanya Deb, Rise of Shaktism, Religious Synthesis, literary synthesis, Ramprasad Sen, Kamalakanta Bhattacharya.

শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়: শাক্ত পদাবলীর সামাজিক দর্পণে

অনিন্দিতা অধিকারী

"জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী।
যে তোমায় যেভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজী॥
মগে বলে 'ফরাতারা' গড' বলে ফিরিঙ্গী যার মা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী॥
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা।
সৌর বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী॥"[১]

'ধর্ম' শব্দটির মূলে রয়েছে √ধৃ ধাতু। যার অর্থ যা ধারন করে অর্থাৎ কোনও লক্ষণ, প্রকৃতি বা গুন। বৃহত্তর অর্থে মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা। আবার আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ধর্ম হল একটি ভাববাদী চিন্তা বা চেতনা, পন্থা কিংবা বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবনদর্শনের সমষ্টি। প্রাচীনকালের মানুষ যখন কোনও প্রাকৃতিক ঘটনাকে তাদের অপরিনত বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়নি, তখন থেকে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের জন্ম। এখান থেকেই ধর্মের বা Religion-এর উৎপত্তি বলে গবেষকরা মনে করেন। যদিও উন্নততর মানবসভ্যতায় 'ধর্ম' ক্রমশ এক জটিল, দৃঢ়, সুসংস্কৃত, বহুধাব্যাপী তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে অন্য মাত্রা বহন করেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ –নানা নামে, নানা পন্থায় মানুষ তার আধ্যাত্মিক স্বরূপ সন্ধানে রত হয়েছে।

ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হিন্দু। সুপ্রাচীন এই ধর্মটির কোনো একক প্রবর্তক নেই। গবেষকরা মনে করেন, বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্রনের, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আজকের হিন্দুসম্প্রদায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাগার্য প্রাচীন ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর উপাসনার রীতি প্রচলিত ছিল। তারপর আর্য আগমনের পর হিন্দুধর্ম নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০ থেকে ১৪০০ অব্দের মধ্য সময়কালে ভারতীয় ভূখন্ডে ইন্দো-আর্যগোষ্ঠীর আগমনে শুরু হয় বেদ-নির্ভর বৈদিকযুগ। পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দে ভারতবর্ষে জন্ম নেয় বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে হিন্দুধর্মের রামায়ণ-মহাভারত ও বিপুল সংখ্যায় পুরাণগুলি রচিত হয়। এই সময়কালকে বলা হয় হিন্দুধর্মের পৌরানিকযুগ। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালকে হিন্দুযুগের স্বর্ণযুগ বলা হয়। গুপ্তযুগেই হিন্দুধর্মশাস্ত্র ও আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে। এইসময়ই হিন্দুদর্শনের ছয়টি শাখা- সাংখ্য,

যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত গড়ে ওঠে। মানুষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধিমানসিক সমস্যা দূরীকরণে কল্পিত করা হতে থাকে অজস্র দেবদেবী। এই সময়কালেই এই ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারে জন্ম নেয় শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য নানা সম্প্রদায়। এদের মধ্যেও আবার নানা উপসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এভাবেই শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য সম্প্রদায় আবার কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞানমার্গ, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদে বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ আপাতবিরোধপূর্ণ নানাভাগে বিভক্ত হিন্দুসম্প্রদায়। এইসমস্ত নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায় একে অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে যেমন তেমনি নানাসময়ে অন্যপন্থার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সম্প্রদায়গত বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তার ওপরে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতন ছিল আর্যপ্রণীত বর্ণাশ্রমব্যবস্থা। উচ্চশ্রেনীর হিন্দুদের গোঁড়ামি, শাস্ত্রবিধির কঠোরতার জন্য নিম্নবর্গের হিন্দুরা নানা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। ফলে হিন্দুসমাজেও আবার দু'টি ভাগ হয়ে যায় – একদিকে শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের অনুসারী উচ্চবর্ণের দল, অন্যদিকে অনার্য নিম্নবর্ণের দল- যারা কৌমসমাজের সংস্কার ও আচারআচরণ পালন করতে থাকে। বিধর্মী মুসলমান আক্রমনে শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম আপন তাগিদেই কৌমসমাজকে গ্রহণ করল। এই দু'য়ের মিলন ও মিশ্রণের উপহার পেল বাংলা সাহিত্য। তাছাড়া নিম্নবর্গের যেসকল মানুষেরা উচ্চবর্গ দ্বারা বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছিল তারাও ধর্মান্তরিত হয়ে রাজশক্তি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। অন্যদিকে বিধর্মী মুসলমানদের সঙ্গে যে বিশাল বিরোধ ও বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা অনেকটাই প্রশমিত হয়। ইসলামের সূফীবাদ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি মিলনক্ষেত্র তৈরি করেছিল। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সুতরাং অস্ট্রিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠি অধ্যুষিত অনার্যরা প্রথমে আর্যসংস্কৃতি একে একে বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র, নাথপন্থ এমনকি ইসলামকেও গ্রহণ করে বৈচিত্রের মধ্যে এক সমন্বয়ের সুর তৈরি করেছে।

এতো গেল সমন্বয়ের কথা, কিন্তু এক ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য ধর্ম বা ধর্মসম্পদায়ের বিরোধও কম ছিল না। কবি ও জনসাধারনের মধ্যে যে অসহিষ্ণু ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মবোধ জাগরিত ছিল তার প্রমান সাহিত্যের আনাচেকানাচে প্রায়শই লক্ষ্য করি। হিন্দুমুসলমানের এই দুটি সম্প্রদায়ের বিবাদ ও সুবাদের চিত্র আমরা পুরো বাংলাসাহিত্যে দেখি কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে-পুরোনো বাংলাসাহিত্যে শুধু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরই রেখচিত্রইনয়, পাওয়া যায় হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বিভেদের, বিচ্ছেদের ছবি। সেই বিরোধকে অতিক্রম করে সমন্বয়বাদী জীবনচেতনায় উত্তরণের চেষ্টাও দুর্লভ নয়।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগান। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে স্বধর্মকে রক্ষা করতে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা চর্যাগানগুলিকে রচনা করেছিল। এখানেও দেখি উচ্চবর্ণকর্তৃক শোষন ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি অস্পৃশ্যতার ছবি-

"নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহারি কুড়িআ।
ছই ছোই যাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ॥" [২]

মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়েছিল। এই দুই ধর্মের বিরোধও সর্বজনবিদিত।শৈবধর্মেরও যথেষ্ট প্রচার ঘটেছিল। আদ্যাশক্তি মহামায়া শিবের গৃহিনী হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে শাক্ত ও শৈবধর্ম একইসঙ্গে বহুক্ষেত্রে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আসলে যে সামাজিক পটভূমিতে বৈষ্ণবধর্মের আর্বিভাব সেখানে শাক্তধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য ছিল। উভয়ের আচারঘটিত বৈপরীত্য, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ছিল ইতিহাসের অনিবার্য ফলশ্রুতি। বহুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে শক্তিসাধনারপীঠভূমি হিসেবে গড়ে উঠেছে। শক্তিউপাসনা প্রাগার্যঅস্ট্রিক, দ্রাবিড়গোষ্ঠীর দান। পরে আর্যীকরণের ফলে উন্নততর দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা আরোপ ঘটেছে। কান্যকুব্জাগত বেদাচারীব্রাম্ভনরা বেদাচারসম্মত পৌরাণিকপদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধারণের মধ্যে এইধরণের পুজাই(পশুভাবেরপূজা) প্রচলিত হয়। এইসময় রচিত হয় মার্কন্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত ইত্যাদি পুরানসমূহ। এগুলিতে ভয়ঙ্কর কালিকাচামুন্ডাপার্বতী ও চন্ডীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া এক দেবী কল্পনা করা হয়েছে। বাংলায় মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সভ্যতার যে সূক্ষস্রোত সমাজে প্রবাহিত ছিল তার সঙ্গে মিশে পৌরানিক শক্তিবাদ সহজেই জনসমাজে জায়গা করে নেয়। তাই বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের সর্বাত্মক বিকাশের পূর্বেই শাক্ত উপাসনা প্রচলিত হয়েছে। ‘কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়’, ‘সদূক্তিকর্ণামৃত’, ‘প্রাকৃতপৈঙ্গলে’-এ শিবশক্তি নিয়ে রচনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় সেনযুগের সময় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার শুরু হয়, এইসময় হিন্দুতন্ত্রাচারের নিদর্শন থাকলেও রাজসমর্থনবঞ্চিত হতে থাকে। কারণ সেনবংশ ছিল বৈষ্ণব। তাহলেও বলতে পারি যদিও এইসময় মধুররসের আরাধনাই মুখ্য হয়ে ওঠে তবুও সেন রাজারাও হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের মোহময় আকর্ষণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। এইসময় জয়দেবের গীতগোবিন্দের ললিত আবেশে মুখরিত হয়েছিল সমগ্রদেশ। তবে শাক্ত-বৈষ্ণব এই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি। চর্তুদশ পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলী রচনাকার মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি কালীর বর্ণনা করেছেন-

“বাসররৈনিসবাসনসোভিত
চরণ, চন্দ্রমনিচূড়া।
কতওকদৈত্যমারিমু’হমেলল,
কতওউগিলকৈলকূড়া॥
সামরবরণ, নয়নঅনুরঞ্জিত
জলদ-জোগফুলকোকা।
কটকটবিকটওঠ-পুটপাঁড়রি
লিধুর-ফেনউঠফোকা॥[৩]

পঞ্চদশ শতকেও নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বে দম্ভপূর্বক বিষহরির পূজা, মঙ্গলচন্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস সহযোগে বাসুলী পূজার উল্লেখ দেখতে পাই (‘চৈতন্যভাগবত’)। ক্রমশ বৈষ্ণবদের কাছে শক্তিসাধনা বেশ নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। শক্তিসাধনার রহস্যময় প্রকৃতি নিজেদের চারিদিকে

আবরণ সৃষ্টি করায়, আবৈষ্ণব জনসাধারণের কাছেও অহেতুক ভয় ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে তা বেশ নিন্দনীয় ছিল। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ ঘটে। ফলত শাক্ত-ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য ছিল। নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলেছে, তার চিহ্ন আজও বর্তমান।

শাক্ত আর বৈষ্ণবদের পারস্পরিক বিরোধ আর চূড়ান্ত বিদ্বেষের নিদর্শন পাওয়া যায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের চাপাল-গোপাল উদ্ধার কাহিনিতে। কাহিনিতে রয়েছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নেওয়ার কিছুদিন আগে একবছর ধরে পরিকরসহযোগে পরমবৈষ্ণব শ্রীবাসঠাকুরের গৃহে রাত্রে রুদ্ধদ্বার করে সংকীর্তন করতেন। নবদ্বীপের এক কটুভাষী বাচাল ও 'পাষন্ডীপ্রধান' 'দুর্ম্মুখ বাচাল' ব্রাহ্মনগোপাল চাপাল শ্রীবাসের অঙ্গনে ভবানীপূজার সামগ্রী অর্থাৎ জবাফুল, কলাপাতা, মদ্যভান্ডার ইত্যাদি রেখে শ্রীবাসকে ভবানী বা অপদেবতার পূজারি বলে প্রতিপন্ন অপদস্থ করতে চায়।

"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওডফুল,
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তন্দুল।
মদ্যভান্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।"[৪]

সকালবেলায় শ্রীবাস ওই শক্তিপূজার উপকরণ দেখে লোকের ডেকে এনে দেখালেন। ঘৃণাভরে নিজের হাতে স্পর্শ করলেন না, হাড়ি এনে সব পূজার উপকরণ দূর করলেন। গোময় লেপন করে ঐ স্থান শুদ্ধ করলেন।

"দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন দুরাচার॥
হাড়িকে ডাকিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল॥[৫]

এর তিনদিন পরেইশাস্তিস্বরূপ চাপালগোপালের কুষ্ঠ হলে মহাপ্রভুর কাছে গেলে মহাপ্রভু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন -

"শ্রীবাসেরে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন।"[৬]

পরে চাপালগোপাল মহাপ্রভুর কৃপায় সুস্থ হন ও বৈষ্ণবভক্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি যতটা মহাপ্রভুর উদারতা প্রকাশের চিত্র ঠিক অপরদিকে ভবানীপূজার উপাচার দেখে ক্রুদ্ধ হওয়া এবং হাড়ি দিয়ে গোময় দিয়ে শুদ্ধ ঘটনাটি তৎকালীন সাম্প্রদায়িকবিরোধ উত্তেজনা, ধর্মীয়সংকীর্নতার বাস্তব চিত্রাঙ্কন বলতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবে বৈষ্ণবধর্মের ভাববন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় সারা বঙ্গ। এর ফলে অনেক শক্তিসাধক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে ছিল। বাশুলীসেবক চন্ডীদাস পূর্বেই বৈষ্ণব হয়েছিলেন। এমনকি মহামায়ার

উপাসক গোবিন্দদাসও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এর বিপরীত সুরও শোনা যায়। জ্ঞানদাস দীক্ষিত বৈষ্ণবকবি হলেও 'চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চকে দিল ময়ূরপুচ্ছ' – এই পদে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় চন্দন-তিলকের ওপর ফাগচূর্ণকে রজতপাত্রে জবাফুলের সঙ্গে তুলনায়। শক্তিপুজোর অন্যতম উপকরণ জবাফুল বৈষ্ণবদের কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও তিনি ব্যবহার করেছেন।

চর্তুদশ-সপ্তদশশতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর একক মহিমা লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব স্ত্রী-শূদ্র-চন্ডাল, এমনকি মুসলমান শ্রেণির মানুষকে বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিয়ে গণতন্ত্রীকরণ ঘটায়। তবে যেই চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম বিতরণের মাধ্যমে সমাজবিপ্লব ঘটিয়েছিল কিন্তু তার তিরোধানের পর বৈষ্ণবধর্ম ক্রমাগত ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত হতে থাকে, তৈরি হয় গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্ম। শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শনের নিগূঢ় নাগপাশে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা আবার বৈষ্ণবসমাজের অঙ্গনচ্যুত হয়। এইসময় বৈষ্ণবধর্ম তন্ত্রের যৌনযোগাচারের কবলে পড়ে বিকৃত হতে থাকে। উদ্ভূত হল সহজিয়া বৈষ্ণবসমাজ। অবক্ষয়িত বৈষ্ণবধর্মকে কটাক্ষ করে লোকজীবনে তাই জন্ম নিয়েছে –

বোষ্টম টোমটোম
হাঁড়ির ভিতর সুধা আছে
কচ্ছপ খাওয়ার যম" –

এইসময় থেকে শাক্তধর্মের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বিষ্ণু ও শিবের কোন পার্থক্য করলেন না। হরি ও হরের অভেদতত্ত্ব প্রচার করার জন্য ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবের কাশীনির্মাণ অধ্যায়টি সংযোজন করেছেন। শিবের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-

"হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদ যেজন ভজে সেই ভক্ত বীর।"[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ-রাষ্ট্রনীতি-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই ভয়াবহ ভাঙন দেখা দেয়। এইসময় বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর জন্য রাজস্ব আদায়ের নির্মম পন্থা অবলম্বন করে। বিচারের নামে প্রহসন, নৈতিক অবক্ষয়, মগ-ফিরিঙ্গি-পতুর্গিজ, বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। এই রাষ্ট্রীয় বির্পযয়ে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রজারা বিপন্ন হতে থাকে। চারিদিকে এই মাৎস্যন্যায় অবস্থায় ক্লান্ত ও অবসন্ন বাঙালীজাতির কাছে বাস্তবতাবর্জিত মধুররস আর জাতির ভাগ্যনির্ণায়ক মানদন্ড হতে পারল না। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জাতি এমন একটি বরভয়দাত্রী আশ্রয়ের জন্য মানসিকভাবে উন্মুখ হয়ে পড়ল যা তাদের বাস্তব যন্ত্রণা থেকে মানসিক মুক্তি প্রদান করবে। মঙ্গলকাব্যের হিংস্র, রুষ্ট, প্রতিষ্ঠালোভী, ঈর্ষাকাতর কোপিতাস্বভাব দেবী নয়। সকলপ্রকার হীনতা ও দীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পুরাণ ও তন্ত্রের অলৌকিক মহিমা দ্বারা পূত স্নাত হয়ে দেবী আত্মপ্রকাশ করলেন সবৈশ্বর্যময়ী মহামহিমান্বিতা, মূলশক্তিরূপিনী জননী ও কন্যারূপে। তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী অথচ বরাভয়দায়িনী করুণারূপিনী অনন্তস্নেহময়ী জননী। ভক্তের কাছ থেকে জোর করে পূজা আদায়ের পরিবর্তে ভক্ত তার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, সন্তানবাৎসল্যা, স্নেহকাতরা দেবীর আশ্রয় চাইল। দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তরা গাইলেন-

"উমা আমার সামান্য মেয়ে নয়।"[৮]

এইসময় শাক্ত ও শৈবধর্মের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই নবরূপপ্রাপ্ত শাক্তধর্মের প্রধান আশ্রয় দুর্গা নয়-কালী। মাতৃ আরাধনার যে মহান আদর্শ, দিব্যভাব তন্ত্রশাস্ত্রে গোপন ছিল, শক্তিসাধকরা তাকে প্রকাশ করলেন। কায়াসাধনার গূহ্য, গোপন, দুর্ভেদ্য তত্ত্বের আবরণ জনসাধারনের কাছে উন্মোচিত হল। তাই শাক্ত পদাবলীগুলিতে কালের ফসল হিসেবে একদিকে যেমন পৃথিবীর ধূলিমাখাজীবন, মানবিক আবেদন উঠে এসেছে অন্যদিকে তত্ত্ব ও লীলা, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়বাদী চিন্তাচেতনার মিশ্রণ ঘটেছে। সাধকরা সাধনার উচ্চমার্গে অবস্থান করে উপলব্ধি করলেন কালীকৃষ্ণ শিবরাম প্রভৃতি সকল দেবদেবী যে এক মূলসত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময়রূপ। ফলে শাক্তভক্তের সাম্প্রদায়িকতা অনেকটা নমনীয় হয়ে উদারতর পটভূমিকায় স্থাপিত হলো এবং শাক্তকবিরা উদার অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হলেন। তাই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে চলে আসা শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক নূতন সমন্বয় লাভ করেছিল।

সাধারণভাবে দেখা যায়, এইসময় সমাজের জনসাধারণ ও যুগের দাবিতে এইসময় ধর্মের ক্ষেত্রে এক সমন্বয়বাদী চিন্তাচেতনা বহন করেছে। জনসাধারণের এই ধর্মসহিষ্ণুতার মনোভাবের জন্যেই শাক্ততত্ত্বের মধ্যে অন্যান্য ধর্মমতের দেবদেবীর সমন্বয়ীকরণ সম্ভব হয়েছে। আর কবিদের প্রচারিত সমন্বয়বাদ ও জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ করেছে।

সাধককবি রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় অনাচার ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে গোঁড়ামীমুক্ত সমন্বয়ের কথা সুরের কথা সুরে বেঁধে তুলে দিয়েছিলেন কালের তরীতে-

'ও মন, তোর ভ্রম গেল না,
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লোনা,
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূলকথা মানে বোঝনা,
...প্রসাদ বলে, গন্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা
(তুমি) শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাক্‌তে হ'লে কাণা॥[৯]

রামপ্রসাদ মধুরমূর্তি রূপেই কালীকে দেখতে চান। তাই শ্যামার রূপবর্ণনা করতে বসে যে রূপ ধ্যান করেছেন তা শ্যাম না শ্যামার তা বোঝা যায় না।

"কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভাবি।

নিজ-তনু আধা, গুনবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতবাটি এলোচুল চূড়াবংশীধারী॥
... মহাকালকানু, শ্যামাশ্যামতনু, একইসকল, বুঝিতেনারি॥"[১০]

তাই কবি মায়ের কাছে জানতে চেয়েছেন-

"যশোদা নাচাতো গোব'লে নীলমণি;
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী?"
একবার নাচগো শ্যামা,-
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুন্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড়-নয়নে চেয়ে চেয়ে"[১১]

উল্লেখ করতে পারি 'মা বসন পর', 'ও জননী অপরা জন্মজরাহরাজননী' পদ তিনটি- এছাড়া নানা পদে রামপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ লক্ষ করা যায়।

সাধক কমলাকান্তও বললেন-

"জান নাকি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দনু'জ- তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশি ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।"[১২]

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় রামলালদাসের "অভেদে ভাবরে মন..."'পদটি । কবি যখন লেখেন 'মোহনমুরলীধারী চতুর্ভুজামুন্ডমালী' এখন কবির মানসপটে শ্যাম ও শ্যামার দ্বৈতরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে:

"ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামূর্ত্তি, কভুকাল, কভু যে কালী।
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এ সকলি॥
শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ বৃথা সে দলাদলি:
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরাম, দূর্গাকালীরাধাশ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী॥"[১৩]

নবাই ময়রাও হৃদয়ে শ্যামরূপেই শ্যামাকে আরাধনা করতে চান-

"হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নর-করকটিবেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,

মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ও গো ও পাষাণের মেয়ে।'[১৪]

দাশরথি রায় লিখলেন –

"মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বাহন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥"[১৫]

তাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যেসকল- যাত্রা-পাঁচালী, কবিগান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের সুর দেখতে পাই। প্রসিদ্ধ নাটককারের 'জনা' নাটকেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদতত্ত্ব প্রকাশ ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের একটি উজ্জ্বল পটভূমি রচনা করে দিয়েছে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি সকল কবিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান গাইলেন। এই যুগেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উর্ধ্বে মানবতা, সাম্প্রদায়িক অভেদ-তত্ত্বের যে বীজ রোপিত হল

উনিশ শতকের নবজাগরনকালে একেশ্বরবাদ, মানবতাবাদী সমাজ-ধর্মসংস্কার ঘটেছিল তার যেন সলতে পাকানো শুরু হয়ে গিয়েছিল এ যুগেই। তাই সম্প্রীতির বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মানবতার মন্ত্রে- "হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মাসেই রূপ ব্যবস্থাকরেছেন...দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়, তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় ক'ল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছান যায়, যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন।"

তথ্যসূত্র:

১. নন্দী রামদুলাল, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী (চয়ন)' ৩০৯ নংপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নবম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ২০৬
২. মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩, কলিকাতা, পৃষ্ঠা. ১৯
৩ বিদ্যাপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, 'বিদ্যাপতি', ৭৬৬ সংপদ
৪. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত- লঘুসংস্করণ, আদিলীলা, ১৭, সাহিত্য একাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০২, পৃ. ৩৩
৫. তদেব
৬. তদেব
৭.বন্দোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী', তৃতীয়সংস্করণ, পৃ. ১০৯
৮.নন্দী রামদুলাল, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'শাক্তপদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নবম সংস্করণ, পৃ: ১
৯. সেন রামপ্রসাদ, তদেব, পৃ: ১৫৯-১৬০)

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১০০-১০১
১১. তদেব, পৃ. ১৫০
১২.ভট্টাচার্য কমলাকান্ত, ১৪৫ নংপদ, পূর্বোক্ত, ১০১ পৃ.
১৩. দত্ত রামলাল দাস, পৃ.১০২-১০৩
১৪.তদেব, নবীনময়রা, পদসংখ্যা ২২০, পৃ: ১৪৯
১৫.তদেব,দাশরথি রায়, পৃ. ২২১
১৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ, পৃ. ১৪৫-১৪৬, ৩য় ভাগ, পৃ. ৯৭